

বাঁকুড়ার লাল মাটি আজও ভোলেনি সেই গান্ধীবুড়িকে

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

■ বাঁকুড়া

শ্রাবণ বা ভাদ্রের মেঘলা আকাশে যখন স্বাধীনতা দিবসের তোড়জোড় শুরু হয় তখন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুই গ্রামের বাতাস যেন এক অন্য গন্ধ শোনায।

বাঁকুড়ার মাটি চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে স্বদেশি, অসহযোগ কিংবা লবণ সত্যাগ্রহের সাক্ষী থেকেছে। কিন্তু এই মাটির বুক থেকেই উঠে এসেছিলেন এমন এক নারী, যাকে ইতিহাস এবং এলাকার মানুষ ভালোবেসে নাম দিয়েছেন— ‘বাঁকুড়ার গান্ধীবুড়ি’। ননীবালা গুহ।

১৮৮৬-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি আকুই গ্রামের এক সাধারণ রক্ষিত পরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর। মাত্র নব্বই বছর বয়সে গ্রামেই জগৎদুর্লভ গুহর সঙ্গে বিয়ে, আর তার ঠিক দু'বছরের মাথায়, মাত্র ১১ বছর বয়সে জীবনের সব আলো নিভে যাওয়া— সবটাই হতে পারত আর পাঁচটা তৎকালীন গ্রামীণ নারীর ট্রাজেডি। কিন্তু ননীবালা সেই পথ হ্যাঁটেননি। গান্ধীজির আদর্শ যখন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই ঢেউ এসে লাগল তাঁর মনেও।

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুরের কাঁথি— দীর্ঘ পদযাত্রায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও নারীদের টেনে এনেছিলেন রাজপথে। ইন্দাসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পিকেটিং, বিলিতি পোশাক ও পণ্য বর্জন, রেললাইন উপড়ে ফেলার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ থেকে শুরু করে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন— প্রতিটি আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই তেজস্বিনী নারী। ব্রিটিশ পুলিশ থেংগার করে জেলে পাঠালেও তাঁর আত্মবিশ্বাস ভাঙতে পারেনি। জেল থেকে বেরিয়েই আবার



আকুই স্কুল মোড়ে ননীবালা গুহর

পূর্ণবিয়ব মূর্তি

— এই সময়

একই উদ্যমে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের মুক্তিসংগ্রামে।

আকুই গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা রমাপ্রসাদ সেন ও পঞ্চজ মাজিলা জানালেন, ননীবালা গুহ কেবল রাজনৈতিক বিপ্লবেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ বদলাতে হলে নারীশিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য। তাই নিজের বসতবাড়িটি অকাতরে দান করে দিয়েছিলেন শিক্ষার মন্দিরের জন্য। ১৯৩৯-এ তাঁরই বদান্যতায় গড়ে ওঠে আকুই ননীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৫৯-এ স্থাপিত হয় আকুই ননীবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। স্বাধীন ভারতের জন্য যার এই চরম আত্মত্যাগ, ১৯৭২-এ ভারত সরকার তাঁকে বিশেষ ‘তাম্রপত্র’ ও রাষ্ট্রীয় পেনশানে ভূষিত করে। ১৯৯০-এর ১৭ এপ্রিল পরলোক গমন করেন বাঁকুড়ার গান্ধীবুড়ি। ২০১৬-য় আকুই স্কুল মোড়ে তাঁর একটি পূর্ণবিয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। গবেষক তথা অধ্যাপক সৌমেন রক্ষিতের মতে, ‘ননীবালা গুহর লড়াই প্রমাণ করে দেয়, স্বাধীনতার স্বপ্ন শুধু শহরের ড্রয়িংরুমে আটকে ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের মোঠাপথে, মেহনতি মানুষের ঘরে এবং নারীদের অদম্য সাহসের ভিতরেও।’